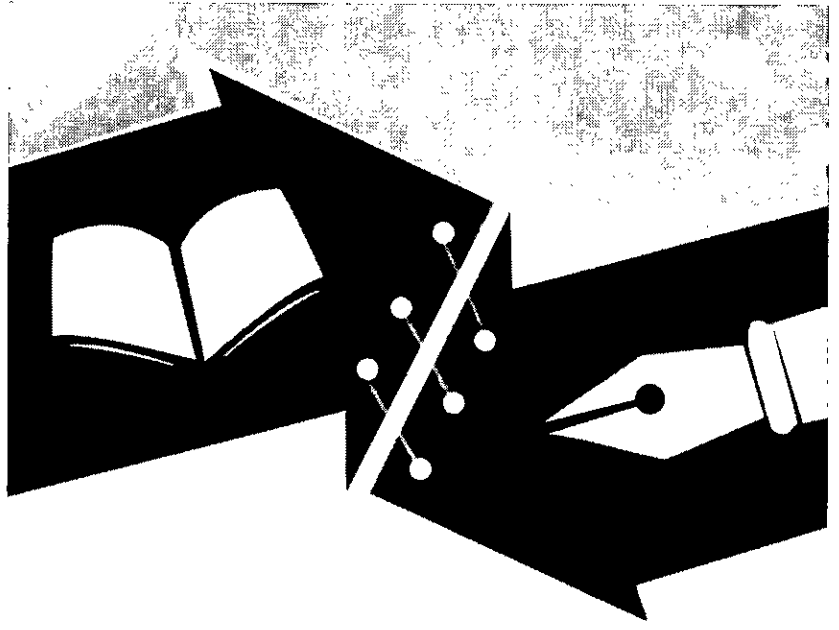


আবুল কাসেম ফজলুল হক

শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা কিছু জরুরি বিবেচ্য



শুধু চিন্তা দিয়ে হবে না, কাজ লাগবে।
লাগবে সংঘর্ষ। জাতীয় শিক্ষানীতি ও
শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য পরিচ্ছন্ন
কর্মসূচি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আন্দোলন
গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলন গড়ে ওঠার
আগেই সরকার যদি এই সংস্কার প্রস্তাব
গ্রহণ করে নেয় এবং এর বাস্তবায়ন আরম্ভ
করে, তাহলে তা সরকার ও জনগণ সবার
জন্যই কল্যাণকর হবে। বাংলাদেশ
জনগণের রাষ্ট্র রূপে গড়ে উঠবে কি না তা
বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষানীতি ও
শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ওপর

বাংলাদেশে সমাজের স্তরে স্তরে জনসাধারণকে মনোবলহারা দেখা যায়। পরিবার দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, জীবন-জগতের প্রতি ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। গ্রাম-শহরে, বিশেষ করে শহরগুলোয় অপরাধ ও অপরাধপ্রবণতা বেড়ে চলছে। দুর্নীতি ও জুলুম-জবরদস্তি বাড়ছে। আত্মহত্যা বাড়ছে। আশির দশকের প্রথম দিক থেকেই নিয়ন্ত্রণনৈতিকরণ চলছে। তবে দলাদলি আছে। এখানে কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ বিএনপি, কেউ জামায়াত, কেউ রাজাকার, কেউ মুক্তিযোদ্ধা। মানুষ কোথায় এখানে? সমাজের সংহতি কমেছে, বিলুপ্তি বাড়ছে। ঢাকা শহরে অল্প জায়গায় অনেক লোকের বসবাসের কারণে ও যানজটের কারণে জীবনযাত্রা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলছে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ১৪টি ধারায় বিভক্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও বিভক্তি কম নয়। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচি ভালো নয়। পরীক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত খারাপ। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে মেধাবী ও উদ্যোগী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নাগরিকত্ব গ্রহণে আগ্রহ বেড়ে চলছে। দেশে কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়েছে, সরকারের আয়ও অনেক বেড়েছে। তবে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে চলছে অবক্ষয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা-দুটিরই গতি খারাপের দিকে। জনগণ মনোবলহারা। রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কিত হওয়া যায় না। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ও বিশ্বমানবতার কল্যাণে পুনর্গঠিত করা হলে সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও প্রগতির পথে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। রাজনীতির উন্নতির প্রশ্ন আছে। সরকার শিক্ষা আইন ২০১৬ নামে যে আইন জারি করেছে, তা নিয়ে আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে শিক্ষা-সংস্কার নামে একটি প্রবন্ধে তলস্তয়ের লেখা থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছিলেন : It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government, but also consciously avoiding its participation. The strength of the government lies in the people's ignorance, and the government knows this, and therefore will always oppose true enlightenment. এই উক্তিটির মধ্যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর সত্য নিহিত রয়েছে। তবে রাষ্ট্র চালিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারকে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শিক্ষিত লোক দরকার হয়। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র সরকারের চরিত্র ও নীতির ওপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার দরকার। অপব্যবহার জায়গায় সুব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এর জন্য প্রথম পর্যায়ে দরকার সর্বজনীন কল্যাণে যুক্তি অবলম্বন করে দূরদর্শী চিন্তাভাবনা, আলোচনা-সমালোচনা ও বিচার-বিবেচনা। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে সেই লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে চেষ্টা চালালে সব সমস্যারই সমাধান করা যাবে। অন্যথায় যত চেষ্টাই করা হোক, অবস্থার উন্নতি হবে না। লক্ষ্য ও যাত্রাপথ সম্পর্কে পট ধারণা অবলম্বন করে এগোতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি ও শ্রমশক্তির কল্যাণে উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু নৈতিক চেতনার নিম্নগতিমিতার কারণে ভাষ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ অমানবিকীকৃত হয়ে মলোছে। এ অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অন্য নব ব্যবস্থারও সংস্কার দরকার। অতীত সংস্কারের জন্য কতকালের প্রচেষ্টা লাগবে, বলা যায় না। সংস্কারের শর্ত তিরির জন্য কাজ করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, গ্রামাঞ্চলের দৃষ্টিভঙ্গি আর কায়মি স্বার্থবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে সহজে কিছু করা যাবে না। অতীত নির্ণয়ের ও অতীত, অর্জনের জন্য ধার্য কাজ করবেন, তাঁদের সংযত দূরদর্শী ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য কিছুকিছু বিষয় কর্মসূচিভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন-১,

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণির পরিবর্তে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত করে এর মান উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। এ দুটি পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলে কোটিং সেন্টার, গাইড বুক ইত্যাদির ব্যবসায় স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছে এবং শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এগুলো বাতিল করা হলে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলে দেশি-বিদেশি যেসব শক্তি এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তারা পরিবর্তনে বাধ্য দেবে। ২. কথিত সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে এমন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে, যা হবে শিক্ষামুখী, জ্ঞানমুখী। যা শিক্ষার্থীদের মনে অনুসন্ধিৎসা, পাঠানুরাগ, সৃণাগরিকত্ববোধ ও উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগাবে। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আনন্দের যোগ ঘটতে হবে। বর্তমানে শিশু-কিশোররা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে শিক্ষার্থী হিসেবে, কিন্তু তার পরই তারা বইয়ের বোঝা পিঠে নিয়ে পরীক্ষার্থী হয়ে যায়, শিক্ষার্থী আর থাকতে পারে না। এ অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্বব্যাপক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, ইউনেসকো ও ইউনেসফের অল্প অনুসারীরা পরীক্ষা পদ্ধতির অভিজ্ঞত পরিবর্তন সাধনে বাধ্য দেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুরাগীরা দুর্বল জাতিগুলোয় শিক্ষার উন্নতি চায় না, তারা শুধু সার্টিফিকেট দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। জানেই শক্তি-বৃহৎ শক্তিবর্গ এটা বোঝে, এবং এই শক্তিকে তারা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূর্ণক আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনা নিয়ে, জাতীয় ঐক্য অবলম্বন করে, সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হবে। ৩. ইংলিশ ভার্সন বিনুদ করতে হবে। যারা বড় চাকরি পাওয়ার জন্য ও-লেভেল, এ-লেভেল আছে। সে ধারার পাশে ইংলিশ ভার্সনের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশে যারা আজকাল শুধু বিশ্বমান অর্জনের কথা বলেন তাঁরা জাতীয় অস্তিত্ব ও জনজীবনের কথা একটুও ভাবেন না। যারা দ্বৈত নাগরিক, যাদের স্ত্রী অথবা স্বামী অথবা সন্তান দ্বৈত নাগরিক কিংবা বিদেশি নাগরিক, তাঁরা যাতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপসচিব থেকে সচিব, জজকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণমূলক কোনো পদে থাকতে না পারেন, সংবিধানে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটা করা না হলে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গড়ে উঠবে না। ৪. সারা দেশে সব শিশুকে বিদেশি ভাষা শেখানোর দরকার নেই। চাহিদা বিবেচনা করে সংস্থা নির্ধারণ করে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ও আরো কয়েকটি বিদেশি ভাষা ভালো করে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোয় সারা দেশের সব শিশুকে বিদেশি ভাষা শেখানো হয় না। বর্তমানে মূলধারার (এনসিটিবি যে ধারার পাঠ্যপুস্তক জোগান দেয়) বাংলা শাখায় ইংরেজি শেখানোর যে ব্যবস্থা আছে, জনস্বার্থে তার উন্নয়ন দরকার। উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে অন্তত একটি বিদেশি ভাষা সবাইকেই ভালো করে শিখতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা শেখার ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে; ৫. মাধ্যমিক পর্যায়ে মূলধারার বাংলা মাধ্যমের বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখাকে একীভূত করে একধারায় পরিণত করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস, পৌরনীতি ও নীতিশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মূলধারার বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নত করতে হবে। বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সারা দেশে পেশামূলক শিক্ষাকে অল্প প্রসারিত করতে হবে এবং তা পাঠ্যসূচিতে পেশামূলক বিষয়গুলোর সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস ও ব্যবহারিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় রূপে স্থান দিতে হবে। সারা দেশে গরিবদের শিক্ষার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মূলধারা খুব বেশি ত্রুটিপূর্ণ ও বিকারপ্রাপ্ত। মূলধারার বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাকে উন্নত করা হলে তার পাশে মাদ্রাসা ধারাও উন্নতিতে আগ্রহী হবে। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম নিয়ে বিরোধ তীব্র হওয়ার ফলে ও রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি

মাদ্রাসার আধুনিকীকরণে বেশি ব্যস্ত হওয়ার ফলে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তাতে মূলধারার বাংলা মাধ্যম অবহেলিত, বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলছে; ৬. মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যে অবস্থা চলছে তাতে বিরোধমূলক নীতি পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করতে হবে। রাষ্ট্রের সংবিধানের আওতায় থেকে সব কিছু করতে হবে; ৭. যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেগুলোতে সেমিস্টারের মেয়াদ চার মাস কিংবা ছয় মাসের পরিবর্তে এক বছর করতে হবে। পরীক্ষার ফল প্রেড পয়েন্টে প্রকাশ করা অব্যাহত রাখতে হবে। গবেষণায় গবেষকদের স্বাধীনতা বাড়তে হবে। উচ্চশিক্ষার ২০ বছরমেয়াদি কৌশলপত্রের স্থলে জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূর্ণক আন্তর্জাতিকতাবাদ অবলম্বন করুন উচ্চশিক্ষা নীতি প্রবর্তন করতে হবে; ৮. জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূর্ণক আন্তর্জাতিকতাবাদভিত্তিক কর্মনীতি নিয়ে গ্রেকো-রোমান-ইউরো-আমেরিকান সভ্যতার প্রগতিশীল মহান বিষয়াদিকে-দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদিকে আমাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মস্থ করতে হবে, আর তারের উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বিষয়াদিকে যথাসম্ভব পরিহার করে চলতে হবে। বিশ্বায়নের কর্তৃপক্ষ (যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, ন্যাটো, জি-সেভেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ) ও তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা দরকার। বাইরে থেকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে নিজেদের বিবেচনায়, নিজেদের সত্তায় থেকে নিজেদের সত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতির জন্য এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে; ৯. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বোচ্চ সর্ব পর্যায়ের রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা করার, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও বিচারব্যবস্থায় বাংলা প্রচলনের, বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ও বাংলা ভাষার সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে দূরদর্শী জাতীয় পরিকল্পনা ঘোষণা করে কাজ করতে হবে। বাংলা ভাষা, মুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর ভাষা, ধর্মীয় ভাষা ও বিদেশি ভাষা ইত্যাদি বিবেচনা করে সৃষ্ট জাতীয় ভাষানীতি অবলম্বন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে জনজীবনের বৈচিত্র্য ও এক দৃষ্টিতেই যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঐক্যের ও সবার উন্নতির নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং ১০. (ক) সারা দেশে বিভিন্ন বিষয়ে পেশামূলক শিক্ষার মাধ্যমে বৃহত্তমসংখ্যক যোগ্য, দক্ষ, উৎপাদনক্ষম, উন্নত চরিত্রবলসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টি করতে হবে। (খ) শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শক্তিমান রাষ্ট্র রূপে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ও ভালোভাবে পরিচালনা করার উপযোগী শিক্ষিত লোক তৈরি করতে হবে। অধিকন্তু (গ) দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস ও শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানী ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আরো অনেক গুরুতর বিষয় আছে, যেগুলোকে ক্রমে কর্মসূচিভুক্ত করে নিয়ে এগোতে হবে। শুধু চিন্তা দিয়ে হবে না, চিন্তার সঙ্গে কাজ লাগবে। চিন্তা ও কাজের জন্য লাগবে সংঘর্ষ। জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই সরকার যদি এই সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় ও এর বাস্তবায়ন আরম্ভ করে, তাহলে তা সরকার ও জনগণ সবার জন্যই কল্যাণকর হবে। বাংলাদেশে বাংলাদেশের জনগণের রাষ্ট্র রূপে গড়ে উঠবে কি না তা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ওপর। যদি কোনো বিশ্ব-সরকার গঠিত হয়, তাহলে তার রূপ ও প্রকৃতি হবে আন্তর্জাতিক ফেডারেল এবং তাতে জাতিরাষ্ট্র, জাতি, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ভাষা বিনুদ হবে না-বিকারশীল থাকবে। বিশ্ব-সরকারের কাছে খুব কম বিষয়েরই ক্ষমতা থাকবে, জাতীয় সরকারের কাছেই থাকবে প্রায় সব ক্ষমতা। এ অবস্থায় জাতি ও রাষ্ট্র বাদ দেওয়া যাবে না।